শেফালি

শামীম আহমাদ

স্বরবর্ণ

শেফালি
শামীম আহমাদ

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২১ খ্রি.

প্রকাশক
স্বরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : info.shoroborno@gmail.com

পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
quickkcart.com

প্রচ্ছদচিত্র
Tumul Ibne Mahabub

প্রচ্ছদ
আখতারুজ্জামান

মুদ্রণ
শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

মূল্য
১৫০ টাকা

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Shefali by Shamim Ahmad, Published by : Shoroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 150, ISBN : 978-984-8012-72-7

অর্পণ

শোয়েব রহিমা আলামিন তৈয়ব ইয়াসমিন নাসরিন সুমাইয়া জিম ইসমাইল ইসহাক ও জোহা...

ভাইবোনের এই সারি সারি সেতারা আল্লাহর অশেষ দান। জীবনকে উৎফুল্ল ও উজ্জীবিত রাখে। সবার জন্য শুভকামনা।

এক.

এই নামেন, নামেন। গুলিস্তান... গুলিস্তান নামেন...

এই নিয়ে হাশেম সাহেবকে তিনবার ঢাকায় আসতে হলো। প্রথমবার এসে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার কথা তিনি এখনো ভোলেননি। ব্যাটারা বড় নচ্ছার, গাড়ি না থামিয়েই চিৎকার করতে থাকে, নামেন... নামেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই ধীর-চলন্ত গাড়ি থেকেই তিনি যাত্রীদের হুড়োহুড়ি করে নেমে যেতে দেখেছিলেন। তাদের দেখাদেখি তিনিও নামতে গিয়ে হঠাৎ বাঁক খেয়ে পড়ে যান রাস্তায়। ছিটকে পড়ে হাতের ব্যাগ। কী লজ্জা, কী যন্ত্রণা! সেইসঙ্গে গাড়ি ও গাড়িওয়ালার প্রতি তার ভীষণ ক্ষোভ। তখন গাড়ির ছোকরাটা হেঁকে উঠেছিল, ধুর চাচা, বাম পা দিবেন না!

হাশেম সাহেব এবার আর ভুল করলেন না। ব্যাগটি কাঁধে চালান করে, অন্য হাতে শেফালিকে ধরে নেমে পড়লেন, বাম পা আগে দিলেন। রাস্তার স্পর্শে শরীরটা প্রথমে একটু বাঁক খেল। কোমরের ব্যথাটা চিক করে উঠল, কিন্তু অচিরেই তিনি শক্ত রাস্তায় সটান শরীরে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরই নাম ঢাকা।

বাস চলে গেল। এবার তিনি সুদূর অভিযাত্রীর মতো ঘাড় উঁচু করে চারপাশে একবার দৃষ্টি ফেললেন। অসংখ্য মানুষ। অসংখ্য বাস, গাড়ি আর রিকশা। উঁচু উঁচু দালান। হরেক রকম শব্দ আর হাঙ্গামা। মানুষে মানুষে গিজগিজ করছে চারপাশ। এত মানুষ ঢাকায় কী করে!

হাশেম সাহেব তার জামার বুক পকেট থেকে একটি কাগজ বের করলেন। দুমড়ে-মুচড়ে কাগজটির অবস্থা হয়েছে হাতমোছা পেপারের মতো। বাসের দীর্ঘ যাত্রায় সেটাকে বারবার 'আলহামদু' সুরার মতো পাঠ করা হয়েছে। এবারও তিনি কাগজটি চোখের সামনে ধরে দুবার পাঠ করে আবার যথাস্থানে চালান করে দিলেন। এরপর অতি অবহেলার সঙ্গে একটি রিকশার দিকে ইশারা করে বললেন, এই যাইবা?

কথার ঢঙে তার এই অবহেলা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হলো, কেউ যেন বুঝতে না পারে তিনি ঢাকায় নতুন এসেছেন। তার ভঙ্গি দেখে মানুষ যেন মনে করে, তিনি নিত্যই এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করেন, ঢাকা শহর

তার খুবই চেনাজানা ও পরিচিত। এমনকি তার চেনাজানার পরিধি এতটাই বেশি যে, তিনি এই পুরো শহর ও তার অধিবাসীদের প্রতি রীতিমতো ত্যক্তবিরক্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু দেখা গেল রিকশাওয়ালাও কম অবসন্ন নয়। সেও কোনোরকম বাড়তি আগ্রহ না দেখিয়ে নিজের জায়গা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কই যাইবেন?

হাশেম সাহেব তার অবহেলার পূর্বভঙ্গিটা অটুট রেখে ঝটপট উত্তর দিলেন, ওয়ারি।

এই ঝটপট উত্তরের ক্ষেত্রেও হাশেম সাহেবের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ ঠিকানা সম্পর্কে রিকশাওয়ালাকে নিজের সম্যক অবগতি এবং যথেষ্ট পরিচিতির কথা জানিয়ে দেওয়া, পাছে না আবার তাকে ঢাকায় নতুন বলে সন্দেহ করে বসে। এবার রিকশাওয়ালা এগিয়ে এলো। তারপর আবারও জিজ্ঞেস করল, কই যাইবেন?

হাশেম সাহেব আগের ভঙ্গিতেই বলে উঠলেন, ওয়ারি।

কিন্তু তিনি এবার একটি ভুল করে বসলেন। মানুষের অভ্যাস হলো, পরিচিত কোনো জায়গার নাম বলার সময় জায়গাটির দিকে মুখ ঘোরানো কিংবা হাত ইশারা করা। হাশেম সাহেবও তাই করেছেন। কিন্তু তিনি যেদিকে হাতের ইশারা করেছেন, ওয়ারি আসলে সেদিকে নয়। ফলে রিকশাওয়ালা বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, ওয়ারি তো হেইদিকে না, এইদিকে।

খটাশ করে হাশেম সাহেবের পরিচিতি-ভাবটার ওপর একটি থাপ্পড় পড়ল। ইশ, কী কারণে যে তিনি ইশারাটা করতে গেলেন! অভ্যাসের দোষ, সবই অভ্যাসের দোষ। মন টানছিল ওদিকেই হবে ওয়ারি যাওয়ার গলি। গতবার এসে চিনে গিয়েছিলেন জায়গাটি। কিন্তু ঢাকা বড় আজব শহর। গলি চেনা বড় মুশকিল, সবই একরকম লাগে...।

এরপর হাশেম সাহেব যখন তার 'পরিচিতি'র গালে এই আচমকা আঘাতটি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, ব্যাটা নচ্ছার রিকশাওয়ালা সেই মুহূর্তেই ছুড়ল আরেক আঘাত, কয় নম্বর রোড?

হঠাৎ হাশেম সাহেবের মাথা চক্কর দিয়ে উঠল, তাই তো, কয় নম্বর রোড? কয় নম্বর?... কিছুতেই নম্বর মনে করতে পারলেন না। অথচ পুরো

রাস্তায় বারবার কাগজ দেখে তিনি ঠিকানা মুখস্থ করে রেখেছিলেন, একটু আগেও দেখেছেন। পরিকল্পনা ছিল, এবার ঢাকায় এসে নিজের হাবভাবে অপরিচিতের কোনো আলামতই তিনি রাখবেন না। নামঠিকানা সব গরগর করে বলে দেবেন। কিন্তু কিছুই তো হয়ে উঠছে না! রিকশাওয়ালার আকস্মিক প্রশ্নের আঘাতে তার মাথা থেকে মুখস্থ সকল 'বাণী' গায়েব হয়ে গেছে। কত বড় মুখ করেই-না তিনি শেফালিকে বলেছিলেন, ঢাকা শহর তার কাছে একেবারে পান্তাভাত, সব চেনাজানা। কিন্তু এখন? মান রক্ষার কোনো উপায়ই কি আর অবশিষ্ট নেই? হাশেম সাহেবের মাথায় আকাশ-পাতাল ভাবনা আসে, কী বলা যায়... কী বলা যায়... হঠাৎ পাশ থেকে শেফালি বলে উঠল, নয় নম্বর রোড, সাতাইশ নম্বর বাসা।

হাশেম সাহেব তার ভাবনার আকাশ থেকে এক ঝটকায় মাটিতে এসে আছড়ে পড়লেন। শেফালি কাগজখানা মাত্র একবার দেখেই কীভাবে বলে দিতে পারল! হাশেম সাহেব ছোট বয়স থেকেই সবার সামনে শেফালির স্মরণশক্তির উচ্চ প্রশংসা করে আসছেন। এ নিয়ে মনে মনে তার অদম্য গর্বও আছে। কিন্তু আজ রিকশাওয়ালার সামনে শেফালির এই 'স্মৃতিশক্তি' প্রদর্শনে তিনি মোটেও খুশি হতে পারলেন না। তার পরিচিতি-ভাবখানার শেষ সুযোগও মেয়েটি নষ্ট করে দিলো। তিনি কটমট করে রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাড়া কত?

– চল্লিশ টাকা।

– কীসের চল্লিশ টাকা? কত ভাড়া আমি জানি না!

– বেশি চাই নাই মুরুব্বি, সবার কাছে জিগান, এইটাই ভাড়া।

– ত্রিশ টাকায় যাইবা? কতটুকু পথ, আমি কি চিনি না ভাবছ?

– চল্লিশের কমে কেউ যাইব না। আপনি নতুন বইল্যা ঠগাবার চাই নাই, এককথা কইয়া দিছি। হের কমে কেউ গেলে দেখতে পারেন।

হাশেম সাহেব একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজের থেকেই যেন রণে ভঙ্গ দিলেন। শেফালির হাত ধরে বললেন, নে, উঠ।

শেফালি রিকশায় উঠে বসল। রিকশা চলা শুরু করতেই হাশেম সাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, ঢাকার রিকশাওয়ালারা হলো বদের হাড্ডি। এখান থেকে ওয়ারি কতদূর? এই তো এতটুকু পথ। আমি কি

আর চিনি না! রিকশাওয়ালারা অচেনা মানুষদের আরেবারে চারপাশ ঘুরাইয়া কয় কত দূর। আমি কি আর জানি না এসব!

শেফালি তার বাবার কথা শুনছে কি শুনছে না, তা বোঝা যায় না। সে বরং আকুল নয়নে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে চারপাশ। বিস্ময় ও কৌতূহলে তার ছোট মুখখানি হাঁ হয়ে আছে–শুধু মানুষ, গাড়ি আর বাড়ি। কত জিনিসপত্তর! তবে একটাও পুকুর নেই। বাড়ির পাশে কোনো গরু-ছাগল নেই কিংবা হাঁস-মুরগিও নেই, কী অবাক কাণ্ড!

রিকশা এসে নির্দিষ্ট বাসার সামনে থামল। হাশেম সাহেব গতবারই বাসাটি দেখে গিয়েছেন। অবশ্য তখন ভেতরে যাওয়া হয়নি। বাসাটি দেখতে খুব সুন্দর। দশতলার কম না। সামনে ছোট করে ছাঁটা কিছু পাতাবাহার ও ফুলগাছ। সুন্দর রং, নতুন, চকচকে। এই বিল্ডিংয়ে মিজান সাহেব ও মিসেস পারভিনের বাসা। নবম তলায়। কেয়ারটেকারকে খবর দেওয়া হলো। লোকটি তাদের নিয়ে লিফটে চড়ল। হাশেম সাহেব এর আগেও কয়েকবার লিফটে উঠেছেন। এই জাদুময় ছোট্ট ঘরটিকে তার চমৎকার লাগে, যেন আসমানে আরোহণ।

লিফট থেকে নেমে তাদের একটা রুমে এনে বসানো হলো। ভেতরে সংবাদ দিয়ে লোকটি আবার নিচে চলে গেল। হাশেম সাহেব ভাবলেন, এটাকেই বোধ হয় গেস্টরুম বলে। রুমটা মোটামুটি বড়ই। খুব সুন্দর করে সাজানো। নরম সোফা। চকচকে কাচের টেবিল। ফুলদানি, তাতে সাজানো ফুল। কোনার দিকে একটি কাচের বাক্স, তাতে টলটল করছে পানি আর ভেতরে খেলা করছে রং-বেরঙের ছোট ছোট মাছ। কী চমৎকার সাজানো দেয়াল। কত দেখার জিনিস। শেফালিও ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে থাকে, দেখতেই থাকে তারা। এভাবে দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ যেন তাদের খেয়াল হলো, কেউ তো আসছে না! মিজান সাহেব অথবা তার স্ত্রী, কেউই না...। কোমরে কাপড় জড়িয়ে একটি মেয়ে, বোধ হয় রান্নার মহিলা, একবার শুধু উঁকি দিয়ে কিছু না বলে আবার ভেতরে চলে গেছে। আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে তাদের? দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা এসেছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু এত দামি সোফা, পা তুলে বসতেও কেমন অস্বস্তি লাগে। একটু কাত হয়ে হেলান দিতেও পারছে না, আরামে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। অস্থির লাগে হাশেম সাহেবের। বিশেষ করে তার একটু টয়লেটে

যাওয়া দরকার। তিনি অবশ্য ধারণা করছেন, কোনার ওই দরজা দিয়ে টয়লেট। কিন্তু ভেতরে যেতে মনের মধ্যে সাহস হচ্ছে না। একেবারে নতুন জায়গা। চেনা নেই, জানা নেই, কীসের মধ্যে শেষে কী হয়ে যায়। তা ছাড়া তিনি এসেছেন শেফালিকে এই বাড়িতে কাজের মেয়ে হিসেবে দিয়ে যেতে, শেষে কোন আচরণে, অজানা কোন ভুলে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়, তারও একটি ভয় আছে তার মনে।

হাশেম সাহেব বড় অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। শেফালিও চুপটি করে সোফার একপাশে বসে আছে। প্রথমদিকে ফিসফাস করে দু-একটি কথা তারা বলেছে, তবে এখন দুজনেই একেবারে নিশ্চুপ। নীরব চোখে ঘরের এদিক-ওদিক শুধু দেখেই চলেছে–ত্রিশতম.. একত্রিশতম... বত্রিশতমবার...।

আরও অনেকক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ এক সজ্জিতা সুন্দরী মহিলা তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন। মহিলাকে দেখেই হাশেম সাহেব তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। শেফালিও বাবার অনুসরণ করল। ঘরে ঢুকেই মহিলাটি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও, আপনারা এসে গেছেন...? মেয়েটা তো দেখি খুব রোগা-পাতলা। কাজ করতে পারবে তো? কী নাম রেখেছেন আপনার মেয়ের?

হাশেম সাহেব বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলেন, ওর নাম শেফালি।

মহিলা এবার শেফালির দিকে পুরো চোখ মেলে তাকালেন। ভীরু চোখে শেফালিও একটু তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই মহিলা যেন একটু কেঁপে উঠলেন। নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শেফালির দিকে। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে হাশেম সাহেব বেশ আতঙ্ক নিয়ে এই কেঁপে ওঠা এবং তাকিয়ে থাকা লক্ষ করলেন, তিনি নিজেও যেন একটু কেঁপে উঠলেন। কী জানি কী হয়, সব পরিকল্পনা কি তবে ভেস্তে যাবে? কিন্তু অচিরেই মেঘ কেটে গেল। মহিলা কিছুই বললেন না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, আগে কিছু খেয়ে নিন। পরে কথা বলি।

কেউ কিছু না বললেও হাশেম সাহেব ও শেফালি দুজনই বুঝে নিলো, ইনিই তাহলে মিজান সাহেবের স্ত্রী, মিসেস পারভিন। তারা আগেই নাম জেনে এসেছে। একটু পর রান্নার মহিলা তাদের খাবারের জন্য ডাকতে

এলো। হাশেম সাহেব এবার সকল ভয়-লজ্জা-সংকোচ বিসর্জন দিয়ে বলে উঠলেন, একটু টয়লেটে...

বুয়াটি দরজার দিকে হাত ইশারা করে বলল, এই তো, যান।

যে দরজাটির দিকে হাশেম সাহেব দীর্ঘক্ষণ অসহায় দৃষ্টি নিয়ে শুধু তাকিয়ে থেকেছেন, ঢোকার সাহস করেননি, বাড়ির সামান্য এক বুয়ার অনুমোদনে এবার তিনি সেদিকেই যেন স্বর্গে প্রবেশের আনন্দ নিয়ে ছুটে গেলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর মিসেস পারভিনের সঙ্গে আর বেশি কথা হলো না। শেফালিকে রেখে যেতে বললেন। ভালোই থাকবে, সে কথাও বললেন। এরপর হাশেম সাহেবের হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখে শুনে যাবেন। চিন্তা করবেন না...।

কিছুক্ষণ পর হাশেম সাহেব বাড়ি থেকে একাকী বের হয়ে এলেন। কিন্তু রাস্তায় পা দিতেই তার মনের মধ্যে কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন তার? মনের মধ্যে এত কেমন কেমন করছে কেন তার? যেমন ভেবে এসেছিলেন, তেমন কিছুই ঘটল না। ম্যাডামকে যা বলবেন মনে করে এসেছিলেন, তার কিছুই তো বলা হলো না। ভেবেছিলেন, সবার সঙ্গে কত কথা হবে। এতদূর এলাকায় মেয়েটিকে তাদের কাছে রেখে যাচ্ছেন, তারাও হয়তো কত সান্ত্বনা-আশ্বাস দেবেন, অভয় দেবেন, সাহস দেবেন। বাচ্চা একটি মেয়ে, দু-একটি আদরের কথাও হয়তো তারা বলবেন...।

ভেবেছিলেন, তিনি নিজেও বলবেন অনেক কথা, বড় আদরের মেয়ে, লেখাপড়ায় ভালো। ভীষণ আর্থিক দুর্দশায় না পড়লে কখনো তাকে এখানে রেখে যেতেন না, শেফালির সৎমা, নিজের অসুস্থতা, অভাব-অনটন...। সকলকে ছেড়ে এখানে একাকী থাকা, আপনারা তাকে আপন মেয়ের মতো, ছোট বোনের মতো মনে করবেন, দেখেশুনে রাখবেন। মা-হারা বাচ্চা মেয়েটা আমার...।

কিন্তু না, এসবের কিছুই বলা হয় না। ম্যাডামের থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় শেফালিও দরজা পর্যন্ত বাবার সঙ্গে এসে দাঁড়ায়। হাশেম সাহেবও দাঁড়ালেন। এই তো শেষ সীমা, এখান থেকেই একজনকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, আরেকজন থেকে যাবে দরজার

ওপারে। এতদিনের স্নেহ, মায়া ও মমতার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ এখানে এসেই বিচ্ছিন্ন হবে! বহুদিন আর দেখাই হবে না!!

দরজার সামনে এসে হাশেম সাহেব একটু ঘুরে দাঁড়ালেন। হাঁটু গেড়ে বসে শেফালির মাথায় হাত রাখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে তাচ্ছিল্যের একটি হাসি ছড়িয়ে বললেন, যাহ! মেয়ে দেখি এখুনি কান্না শুরু করে দিয়েছে।

হাঁ, শেফালি কাঁদছে। তবে সে কান্নায় কোনো শব্দ নেই। মুখে কোনো অনুযোগ নেই। একেবারে নীরব অশ্রু। হাশেম সাহেবের ভেতরটা নড়ে উঠল। তাই তো, এই যে বিচ্ছেদ, এতটা দূরে, আত্মীয়হারা হয়ে নতুন অচেনা পাথারে ভাসতে হবে তাকে! ব্যথাটা বাজবে কার বেশি? হৃদয়টা কার সবচেয়ে বেশি নরম? সবচেয়ে বেশি অবুঝ!

হাশেম সাহেব বলতে শুরু করলেন, কাঁদে না মা! এখানে কত সুখ। কত জিনিস। তুই কত ভালো থাকবি, পরবি-খাবি। কোনো কষ্ট নেই। আমি প্রায়ই এসে দেখে যাব। নিয়েও যাব। আমের সময়, মাছ ধরার সময়...। কাঁদে না মা, কাঁদে না...।

হাশেম সাহেব মুখে এসব বলছেন, কিন্তু নিজের অজান্তে তারও চোখজোড়া কখন যেন ভিজে উঠেছে। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সোজা দরজা পার হয়ে এলেন। লিফট দিয়ে নিচে নামলেন। ঢাকায় আসার আগে তার অন্তরের যে ভাবনা ও যুক্তির জোর ছিল, এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কতবার তিনি ভেবেছেন, অবশেষে এ পথ ছাড়া কোনো উপায় তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু এখন যে আর পা সরতে চায় না। ম্যাডামের হাত থেকে টাকাটা নিতেও তার বড় সংকোচ হচ্ছিল। এ যেন মেয়েবেচা টাকা। কিন্তু উপায়? বাম হাতের আঙুলগুলো দিয়ে হাশেম সাহেব তার চোখের পানি আরেকবার মুছে নিলেন। খোদা হে, মানুষের এত কষ্ট কেন?

দুই.

মিসেস পারভিনকে কোনোকালেই নিজে রান্না করে খেতে হয়নি। বিয়ের পরেও না। তবে মাঝেমধ্যে শখের বশে কিংবা বিশেষ আয়োজনের দিনে কিছু কিছু পদ তিনি রান্না করেন। রান্না করেন বলতে, তিনি বসে বসে নির্দেশনা দেন আর রান্নার বুয়া সব প্রস্তুত করে, হাতা-খুন্তি, চামচ

নাড়ে। মাঝে মাঝে চেয়ার পেতে রান্নার বই নিয়েও বসে যান, আর তার সামনে বিভিন্ন পাত্রে হরেক রকম জিনিস নিয়ে হিসাব মেলাতে থাকে রান্নার বুয়া। বর্তমান বুয়াটি এখানে প্রায় চার বছর ধরে কাজ করছে। কথা বেশি বলে, তবে রান্নাও ভালো করে। কিছুটা ভব্যতাও আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এর আগে কোনো বুয়া এতদিন টেকেনি। বুয়ার নাম হীরা। রান্নার বুয়ার এত চমৎকার নাম! হঠাৎ শুনলে কেমন বেখাপ্পা লাগে। তবুও হীরাই তার নাম। তার এই নামের পেছনে লুকিয়ে আছে তার শৌখিন বাবার স্বপ্নবিলাস, একসময় যার আসলেই কিছুটা সচ্ছলতা ছিল। তবে ফতুর হতেও সময় লাগেনি। গ্রামে কুলিয়ে উঠতে না পেরে হীরা তার স্বামীসহ এই প্যাঁচালো ঢাকা শহরে আগমন করেছে। হীরা ঢাকাকে কখনো 'প্যাঁচালো' বিশেষণ ছাড়া উচ্চারণ করে না। আবার নিজেও কম প্যাঁচাল পাড়ে না। শেফালিকে সর্বক্ষণ তার প্যাঁচাল শুনতে হচ্ছে। অবশ্য প্যাঁচাল শোনার কাজও সে করছে, প্রায়ই অকারণে কান্না শুরু করে। ঢাকাতে শেফালির মন বসতে চায় না। হীরাও তার প্যাঁচাল ছাড়ে না। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই বলে ওঠে, কেন যে তুই এই প্যাঁচাল শহরে আইলি! এতটুকু বাচ্চা, বেশি দুঃখে না পড়লে কি আর এই প্যাঁচাল শহরে কেউ আহে? এহানকার মানুষ কি কোনো মানুষ নাকি। সবাই স্বার্থপর, বদ, চোর, বাটপার...। কতটা দুঃখে পড়ে শেফালিকে এই 'প্যাঁচাল' শহরে আসতে হয়েছে, সে কথা অবশ্য হীরা জানে। কিন্তু জানে বলেই কি সে তার প্যাঁচাল ছেড়ে দেবে?!

আজও কান্না শুরু করেছে শেফালি। হীরা এক থাল বিরিয়ানি তার সামনে রাখতে রাখতে বলল, নে, খাইয়া ল। ঢাকা আইছছ খাইতে, খা। গেরামে এইটা কি পাবি? বলছি খাইয়া ল। কাইন্দা লাভ নাই, বেহুদা কানলে মানুষের দুঃখের কহনো শ্যাষ হয় না, এইটা জাইন্না রাখ...।

গতরাতে বাসায় অনেক বিরিয়ানি রান্না হয়েছিল। কিছু মেহমান না আসায় অতিরিক্ত রয়ে গেছে। সেটাই এখন হীরা গরম করে শেফালিকে খেতে দেয়। অথচ শেফালি খাওয়ার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায় না। আগের মতো অঝোরে কাঁদতে থাকে। তার বাড়ির কথা মনে পড়ে। কেঁদে কোনো লাভ নেই তা জেনেও সে কাঁদে। এমন বিরিয়ানি সে হয়তো গ্রামে থাকতে কোনোদিন খায়নি। তবু তার খেতে ইচ্ছে করে না। তাকে এই বাসায় রাখা হয়েছে ম্যাডামের ছেলে সাগরকে দেখাশোনা করার

জন্য, সঙ্গে বাসার টুকটাক ফুটফরমায়েশ। কঠিন কিছু নয়। কিন্তু এখানে তার মন টিকতে চায় না। ছোট ভাই নাজমুলের জন্য তার মন কাঁদে। নতুন মায়ের যে বাচ্চাটি হয়েছে ঝুমুর, তার জন্যও তার অসীম মায়া। কীরকম ছলছল চোখে তার দিকে চেয়ে থাকত! হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলত...। সৎমা তাকে বেশি ভালোবাসে না, তবুও তো ঝুমুর তারই ছোট বোন। মাঝে মাঝে কোলে নিতে পারে, এতেই তার আনন্দ। শেফালি একাকী মনে ভাবে, দরকার হয় না খেয়ে থাকব, মরে যাব, তবু গ্রামেই থাকব, ফিরেই যাব।

বিরিয়ানি সামনে নিয়ে শেফালি তার ভাবনাগুলো আরও সুদৃঢ় করতে থাকে। হঠাৎ ম্যাডামের আওয়াজ পাওয়া যায়, শেফালিকে পাঠিয়ে দাও। ওর বাবা ফোন করেছে।

কথাটি শুনতেই শেফালির মনের মাঝে ঝনাৎ করে ওঠে। সে খাবার রেখে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। ফোন নিয়ে কানে ধরে।

– কেমন আছিস মা?

– ভালো।

– কী করিস?

শেফালি কিছু বলতে পারে না।

– ভাত খাইছিস?

শেফালি তবু চুপ।

– কথা কস না ক্যা? মন খারাপ?

শেফালি বলে ওঠে,

– আব্বা, ঝুমুর কেমন আছে?

– ঝুমুর ভালো।

– কথা শিখছে?

– অল্প অল্প কয়।

– নাজমুল কেমন আছে?

– ভালো।

– নাজমুল কি আমার কথা কয়?

– খুব কয়।

– আব্বা তুমি কবে আসবা?

– কয়দিন আগেই তো দেখা হইল!

হঠাৎ শেফালি বলে ওঠে,

– আব্বা, আমি এখানে থাকতি পারব না। বাড়ি যাব।

– পাগলি মেয়ে, দেখছ না বাড়িতে কত কষ্ট, ভাতই জোটে না।

– আব্বা, আমি দরকার হয় না খেয়ে থাকব...।

– বোকা মেয়ে, না খেয়ে কেউ থাকতি পারে না। শহরে কত মজা। কতকিছু দেখবি। শিখবি। খাবি। কয়েকদিন থাকলি সব ঠিক হয়ে যাবে। মন খারাপ করিস না। আচ্ছা, আমি কিছুদিনের মধ্যেই তোকে দেখতি আসবানি। চিন্তা করিস না।

– আব্বা, আমি বাড়ি যাব।

– বারবার এককথা বলে না। অবস্থা বুঝতি হবি না? এমন সুযোগ সব সময় আসে নাকি? এখন যত কষ্টই হোক, ওখানেই থাকতি হবি।

শেফালির ভেতরটা ভেঙেচুরে খানখান হতে থাকে। তার দুচোখ বেয়ে আবারও অশ্রু নামে। বাড়ি ও গ্রামের জন্য তার মন কাঁদে। গ্রামের কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বাবা-মার সঙ্গে থাকে। খায়দায়। ঘোরাঘুরি করে। মারামারি করে। মকতবে যায়। স্কুলে যায়। খেলাধুলা করে। খালে-পুকুরে একসঙ্গে গোসল করে। ঝাঁপাঝাঁপি করে। যত ঝগড়া আর মারামারিই হোক–তবু কত সুখ। দুনিয়ার সবার জীবন একরকম হয় না কেন? সবার পক্ষ থেকে একলা একজনকে এত কষ্ট করতে হয় কেন?

কান্নাতে দুঃখ শেষ হয় না, কিন্তু কান্না ছাড়া দুঃখ লাঘবের আর কোনো পদ্ধতি কি আছে মানুষের? শেফালি তার বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে আবার রান্নাঘরে ফিরে আসে। বুয়া হীরা খালার কথা তার মনের পর্দায় বারবার আঘাত করে, কাইন্দা লাভ নাই, বেহুদা কানলে মানুষের দুঃখের কহনো শ্যাষ হয় না, এইটা জাইন্না রাখ...।

তবুও শেফালির কান্না থামে না। কোনো লাভ নেই জেনেও সে কান্না করে। দুঃখ লাঘবে কান্নার অধিক মানুষ আর কীই-বা করতে পারে! অবশ্য দীর্ঘদিনের অভ্যাসে শেফালি তার দুঃখ লাঘবের আরও কিছু

কৌশল শিখে নেয়, তবে সে অনেক পরের কথা। এই আজব শহরে শেফালির যেতে থাকে দিন, ক্ষয়ে যায় রাত...।

তিন.

মিজান সাহেব অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মিসেস পারভিন স্বামীর এটা-ওটা গুছিয়ে দিচ্ছেন। এটা তাদের প্রতিদিন সকালের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মিজান সাহেবের নিজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, নিজের অফিস। তার টাইম মেইন্টেইনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবুও তিনি বেসরকারি চাকুরিজীবীদের মতো নিয়মমাফিক ঘড়ির কাঁটা মেনে অফিস করেন। বিভিন্ন মিটিং ও সেমিনারে যান। ফিরতে রাত হয়, কখনো গভীর রাত। কাঁচা টাকার এই এক মধুর জাদুকরী ফাঁদ। বাড়ন্ত টাকা মানুষকে অধিক আরাম-বিশ্রাম দেবে, সেটাই যুক্তির কথা। কিন্তু আসলে কেউ কথা রাখে না। বরং যত টাকা, ততই ছুটে চলা, ততই ব্যস্ততা; ততই পদস্খলিত হওয়া, ততই নির্ঘুম নিরাপত্তাহীন এক অস্থির জীবনের গভীরে প্রবেশ করা। মিজান সাহেবও ভেবে নিয়েছেন, এতদিনের সংগ্রাম-সাধনা শেষে আজ যখন হাতে এত টাকা, তখন অন্যদের মতো তারও নিশ্চয় এদিক-ওদিক একটু পদস্খলিত হওয়ার অধিকার এসেছে কিংবা সেটা মানানসই হয়ে উঠেছে। তাই তিনি আজকাল রাতবিরাতের বিভিন্ন পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন। গতকাল তেমনই এক পার্টিতে হঠাৎ এক মেয়ের সঙ্গে তার দেখা। কথায় কথায় মেয়েটি পারভিন সম্পর্কে কিছু গোপন কথা তাকে বলে। কিন্তু সে এগুলো তাকে কেন বলল? কী লাভ বা উদ্দেশ্য মেয়েটির? সত্য নাকি মিথ্যা? নাকি পারভিনের প্রতি নিছক কোনো মেয়েলি ঈর্ষা তার?

রাতে বাসায় ফিরে ভেঙে পড়া মেজাজ ও শরীর নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা বা অবস্থা তার ছিল না। ভেবে রেখেছেন সকালে বলবেন। এখন চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে সে কথাই তিনি ভাবছেন, কীভাবে শুরু করা যায়। এ সময় পারভিন হঠাৎ বলে উঠল,

– তুমি কাল রাতেও কোথায় যেন গিয়েছিলে। এসব জায়গায় না গেলে কি হয় না?

মিজান সাহেব পেছন ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

– এখন আর হয় না। ব্যবসার পার্টনার, যাদের সঙ্গে ডিল করতে হয়, সবাই যায়, আমাকেও যেতে হয়।

– আর সবাই খায়, তাই বুঝি তোমাকেও খেতে হয় এইসব ছাতামাতা?

– হুঁ।

– কিন্তু তোমার শরীর তো সবার মতো নয়। বাদ দিলে হয় না?

– হয়তো একদিন এমনিতেই বাদ পড়ে যাবে। বাদ দিতে হবে না। ততদিন তো একটু আয়েশ করে যাই, কী বলো?

মিজান সাহেব একটু রসিকতার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা খুব একটা জুতসই হলো না। পারভিন তাতে সাড়া দিলো না। এরপর হঠাৎ কোনো ভুলে যাওয়া কথা মনে হওয়ার মতো মিজান সাহেব বলে উঠলেন,

– আচ্ছা, ভার্সিটিতে শিশির নামে তোমাদের কোনো ক্লাসমেট ছিল নাকি?

স্বামীর মুখে 'শিশির' নামটি শুনতেই পারভিনের বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। বহুদিন ধরে সবার থেকে লুকিয়ে রাখা একটি নাম। ভালোবাসার এবং ঘৃণার। পারভিন বহুবার এই নাম তার জীবন থেকে মুছে দিতে চেয়েছে। কামনা করেছে এই নামের ব্যক্তি, এমনকি এই নামটিও যেন তার জীবনে আর ফিরে না আসে। কিন্তু মানুষের চাওয়া অনুযায়ী সব কি হয়? মানুষ কি তা হতে দেয়? পারভিন নিজের মধ্যে হঠাৎ একটা ঝড়ের ঝাপটা অনুভব করে। কিছুটা শিউরে ওঠে এবং বেখেয়ালে বলে ফেলে,

– কেন?

– আহ, কেন বলছ কেন? আমি জানতে চাচ্ছি এ নামে তোমাদের কোনো ক্লাসমেট ছিল কি না?

– ছিল।

– এখন কি বিদেশ থাকে?

– শুনেছিলাম থাকে।

– কোন দেশে?